একক ০১ ❑ ব্রিটিশ সংবিধানের বিবর্তন ও প্রধান নীতিসমূহ

গঠন

০১.১ উদ্দেশ্য

০১.২ প্রস্তাবনা

০১.৩ ব্রিটিশ সংবিধান

ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস

ব্রিটিশ সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি

আইনের অনুশাসন

০১.৪ সারাংশ

০১.৫ সর্বশেষ অনুশীলনী

০১.৬ উত্তরমালা

০১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

০১.১ ❑ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- ব্রিটেনের যে শাসনতন্ত্র প্রচলিত আছে কিভাবে তা বর্তমান রূপ নিয়েছে।
- সম্পূর্ণভাবে লিখিত না হলেও সেই দেশের শাসনতন্ত্র কিভাবে কার্যকর হয়েছে।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের এক প্রতিশ্রুতি আইনের অনুশাসনের অর্থ কি এবং
- সংসদীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান হিসেবে এখনও ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতির প্রভাব কেন সক্রিয়।

০১.২ ❑ প্রস্তাবনা

ব্রিটিশ সংবিধান হল বিশ্বের প্রাচীনতম সংবিধান। এই সংবিধান কোন সাংবিধানিক পরিষদ দ্বারা ঘোষিত হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে বিবর্তনের মাধ্যমে এই সংবিধান গড়ে উঠেছে। এই এককে আমরা ব্রিটিশ সংবিধানের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব এবং কেন ব্রিটিশ সংবিধান আজও স্বাতন্ত্র্য দাবী করে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

০১.৩ ❑ ব্রিটিশ সংবিধান

রাষ্ট্র মানুষের তৈরি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের আয়তন বড়, সদস্যসংখ্যা অনেক এবং সমস্যাও প্রচুর। তাই প্রত্যেক রাষ্ট্রেই নানাবিধ কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য একটি সরকার গঠিত হয়। সরকারই রাষ্ট্রের পরিচালন সমিতি। সরকারের মূল কাজ তিন ধরনের ঃ আইন প্রণয়ন, আইন প্রয়োগ এবং আইনের ব্যাখ্যা। একটি সরকারের অস্তিত্ব, তার কার্যাবলী ও তার ক্ষমতা বন্টন যে নীতিনিয়মের দ্বারা নির্ধারিত হয় তাই হল সংবিধান। বস্তু পরিচালনার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় এই সমস্ত নিয়মকানুনের সমষ্টিকেই সাধারণভাবে সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বলা হয়।

কোনও দেশের সংবিধান অনেকাংশে নির্ভর করে সেই দেশের ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থসামাজিক কাঠামো, ধর্মীয় বিশ্বাস ও জনসংখ্যার প্রকৃতির ওপরে। তবে যেহেতু সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য হল নাগরিক অধিকার রক্ষা করা এবং সরকারের ক্ষমতাকে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া, সেহেতু সেই পরিপ্রেক্ষিতটিই সংবিধান গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। সংবিধান বা শাসনতন্ত্র শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে ঃ সংকীর্ণ অর্থে ও ব্যাপক অর্থে। শাসনতন্ত্র হ'ল দেশ শাসনের জন্য সমস্ত লিখিত ও অলিখিত নিয়মকানুন। সংকীর্ণ অর্থে সংবিধান হচ্ছে কোন একটি রাষ্ট্রের লিখিত মৌলিক আইনকানুন—যার দ্বারা রাষ্ট্রের গঠন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন ও ক্ষমতা, রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক প্রভৃতি নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ধরনের সংবিধান চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং তা বিশেষ সংবিধান রচনাকারী পরিষদ দ্বারা রচিত ও গৃহীত হয়।

কিন্তু এই অর্থে ব্রিটেনে কোনও সংবিধান বা শাসনতন্ত্রের অস্তিত্ব নেই। কারণ ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার মৌলিক আইনকানুন কোনও একটি দলিলে লিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া যায় না। তাছাড়া কোনও সংবিধান রচনাকারী পরিষদ দ্বারা এই সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয়নি।

মুনরো এবং এয়ার্স্ট (Munro And Ayerst) উল্লেখ করেছেন, ব্রিটিশ সংবিধান কোনও একটি উৎস থেকে উদ্ভূত হয়নি। কোন গণপরিষদ অথবা সাংবিধানিক সম্মেলনের মাধ্যমে তা গৃহীত হয়নি। ব্রিটিশ সংবিধানের নিরবচ্ছিন্নতা প্রায় অদৃশ্য বিকাশের ফল। এই সংবিধান এমন একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে যেখানে সনদ, পার্লামেন্ট প্রাণীত আইন, বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত, রীতি ও ঐতিহ্য এসে মিলিত হয়েছে।

অনুশীলনী—১

১। ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)

(ক) ব্রিটিশ সংবিধান একটি দলিলে লিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া যায় না।

(খ) ব্রিটিশ সংবিধান একটি গণপরিষদের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছিল।

(গ) রাষ্ট্র মানুষের তৈরি একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

২। সংবিধান দুটি অর্থে ব্যবহৃত হ'তে পারে। সেগুলি কী কী? (পাঁচ বা ছয়টি বাক্যে উত্তর দেবেন)

ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস

গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের উৎস হল সনদ (Charter), পার্লামেন্ট প্রণীত আইন (Statute), প্রথাগত আইন (Common Law), সাংবিধানিক রীতিনীতি (Conventions of the Constitution), বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত (Judicial Interpretations and Decisions), আইন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী এবং বিশেষজ্ঞদের অভিমত (Important works on constitutional law and commentaries of the specialists)।

(ক) **সনদ ঃ** গ্রেট ব্রিটেনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে ইংল্যান্ডের রাজন্যবর্গ বিভিন্ন রকম সনদকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। ঐতিহাসিক দলিলরূপে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় ১২১৫ সালের মহাসনদ, ১৬২৮ সালের অধিকারের আবেদন, ১৬৮৯ সালের অধিকারের বিল প্রভৃতি। এই সনদগুলিকে আমরা ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

(খ) **পার্লামেন্ট প্রণীত আইন ঃ** ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এবং সেই সঙ্গে রাজার ক্ষমতা সঙ্কোচনের উদ্দেশ্যে, জনগণের ভোটাধিকার সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত এইসব বিধিবদ্ধ আইন ব্রিটিশ সংবিধানের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এইসব বিধিবদ্ধ আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ১৬৭৯, ১৮১৬ এবং ১৮৬২ সালে প্রণীত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পর্কিত 'হেবিয়াস কর্পাস' আইন, ১৯১১ ও ১৯৪১ সালের 'পার্লামেন্ট আইন' এবং ১৯৭২ সালে প্রণীত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন।

(গ) **বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত ঃ** বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম উৎসরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। আদালত প্রথাগত আইন ও পার্লামেন্ট প্রণীত আইন ব্যাখ্যা করে। আদালতের অনেক রায় সাংবিধানিক দিক দিয়ে গুরুত্ব অর্জন করেছে। আদালতের রায় ব্রিটিশ নাগরিকদের অধিকারের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছে।

(ঘ) **প্রথাগত আইন ঃ** দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত প্রথা রাষ্ট্র-কর্তৃক এবং বিশেষভাবে আদালত কর্তৃক স্বীকৃতি অর্জন করলেই তা আইনের মর্যাদা অর্জন করতে পারে। তবে এই প্রথাগত আইনসমূহ যেমন আইনসভা কর্তৃক প্রণীত হয় না, তেমনি অর্ডিন্যান্স-এর মাধ্যমেও এগুলি ঘোষিত হয় না। তবু এই প্রথাগত আইন ব্রিটেনে ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষক ও ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। পুরান আমলের Common Law Court গুলিতে এই প্রথাগত আইন দীর্ঘকাল অনুসৃত হয়ে এসেছে। রাজা দ্বিতীয় হেনরীর আমলে এগুলিতে সুসংহত রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়।

(ঙ) **সাংবিধানিক রীতিনীতি ঃ** সাংবিধানিক রীতিনীতি বলতে আরমা সেই সমস্ত নিয়মকানুনকে বুঝি সেগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হ'লেও তারা আইনের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শাসনকার্যে নিযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকেই এগুলি মান্য করতে হয়। বস্তুত গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের প্রধান ভিত্তি হ'ল সাংবিধানিক রীতিনীতি। রাজা বা রানির ক্ষমতা, ক্যাবিনেটের সঙ্গে সংসদের সম্পর্ক, দলীয় পরিষদের ঊর্দ্ধে স্পিকারের অবস্থান ইত্যাদি সাংবিধানিক রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘকালের বিবর্তনের মাধ্যমে ওই সব রীতিনীতি গড়ে উঠেছে। ওই সব রীতিনীতির অনুধাবন ব্যতীত গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় না।

(চ) **বিশেষজ্ঞদের অভিমত ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী ঃ** প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ও লেখকদের রচনাবলীও গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের অন্যতম উৎস। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল অ্যানসনের Law and Customs of the Constitution, মে-র Parliamentary Practice, জেনিংস-এর Law and the Constitution ইত্যাদি।

অনুশীলনী----২

১। **ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)**

(ক) ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস হিসেবে সাংবিধানিক রীতিনীতি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

(খ) ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস মোটামুটি ছয়টি।

(গ) ১৬২৮ সালের অধিকারের আবেদন একটি পার্লামেন্ট প্রণীত আইন।

২। বিধিবদ্ধ আইন বলতে কী বোঝায়? (তিনটি/চারটি বাক্যে উত্তর দিন)।

ব্রিটিশ সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক সংবিধানেরই কয়েকটি নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে। ওই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সংবিধানটির মৌলিকতা, ও বিশিষ্টতা সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি। ব্রিটিশ সংবিধানকে বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পাই।

(১) **অলিখিত সংবিধান ঃ** ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত। সনদ, বিচার-বিভাগীয় সিদ্ধান্ত, প্রথাগত আইন, সাংবিধানিক রীতিনীতি ইত্যাদির সমন্বয়ে এই সংবিধান গড়ে উঠেছে। এই সংবিধান কোনও গণপরিষদ, কোনও সাংবিধানিক সম্মেলন অথবা আইনসভা কর্তৃক প্রণীত হয়নি। কোনও একটিমাত্র স্থায়ী এবং বিধিবদ্ধ দলিলরূপে এই সংবিধানকে চিহ্নিত করা যায় না।

(২) **ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনশীলতা ঃ** গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তনশীলতা। এই সংবিধান একটি গতিশীল সংবিধান। অতএব নিরন্তর পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই সংবিধান কখনও পুরনো প্রশাসনিক কাঠামোকে ভেঙে ফেলে নতুন প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেনি। ইংরেজ জাতি প্রকৃতিগতভাবে রক্ষণশীল। ফলে তারা ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী। যেমন তারা রাজতন্ত্রের বিলোপসাধন করেনি। কিন্তু গণতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তার ক্ষমতা হ্রাস করেছে।

(৩) **সুপরিবর্তনশীল ঃ** সুপরিবর্তনীয়তা ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই সংবিধানের পরিবর্তনের জন্য কোন জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয় না। সংসদে সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতেই ব্রিটিশ সংবিধানকে পরিববর্তিত করা যায়।

(৪) **নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ঃ** নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব ব্রিটেনের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তত্ত্বগতভাবে ব্রিটেনের রাজা বা রানি অসীম ক্ষমতার অধিকারী হলেও এবং রাজা বা রানির নামে শাসনকার্য পরিচালিত হলেও তিনি দেশের নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীপরিষদ। রাজা বা রানি রাজত্ব করেন, দেশ শাসন করেন না।

(৫) **এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ঃ** ব্রিটেন হল এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত। এখানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সংস্থা থাকলেও তারা সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা ন্যস্ত ক্ষমতাই ভোগ করতে পারে।

(৬) **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের অনুপস্থিতি ঃ** গ্রেট ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নেই। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের পরিবর্তে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতাই প্রাধান্য লাভ করেছে। এখানে আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আবার লর্ডসভা পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হ'লেও এই কক্ষের বিচারবিভাগীয় ক্ষমতাও আছে।

(৭) **পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা ঃ** পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা বলতে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের চূড়ান্ত ক্ষমতাকেই বোঝায়। আইনগত সার্বভৌমিকতার অধিকারী হিসেবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে, যে কোন আইন সংশোধন করতে পারে, যে কোন আইন বাতিল করতে পারে। ব্রিটেনের কোন আদালতই পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে না। তবে পার্লামেন্টের এই ক্ষমতা অবাধ নয়।

(৮) **আইনের অনুশাসন ঃ** ব্রিটিশ সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল আইনের অনুশাসন। আইনের অনুশাসনের অর্থ হ'ল আইনের প্রাধান্য, সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে আইনের চোখে সাম্য এবং দেশের সাধারণ আইন দ্বারা নাগরিকদের অধিকারসমূহের সংরক্ষণ। আইনের অনুশাসনের জন্যই ব্রিটেনের নাগরিকগণ অন্যান্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করতে পারেন বলে মনে করা হয়।

(৯) **সংসদীয় শাসনব্যবস্থা ঃ** ব্রিটেনকে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মাতৃভূমি বলা হয়। ১২৯৫ সালে রাজা প্রথম এডওয়ার্ড Model Parliament আহ্বান করেন। প্রায় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বলা যায় সংসদীয় শাসনের সূত্রপাত। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ব্রিটেনে বর্তমান যেমন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতি, পার্লামেন্টের কাছে মন্ত্রীপরিষদের দায়িত্বশীলতা, শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব, ক্ষমতা স্বতন্ত্রকরণ নীতির অনুপস্থিতি ইত্যাদি।

(১০) **ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব ঃ** ব্রিটেনে তত্ত্বগতভাবে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'লেও দ্বিদলব্যবস্থা ও সংখ্যা গরিষ্ঠের শাসনের ফলে কার্যত এখানে ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে বর্তমানে ক্যাবিনেটের এই একনায়কত্ব প্রধানমন্ত্রীর অবিসংবাদিত নেতৃত্বেরই অন্য নাম।

(১১) **প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য ঃ** বিগত কয়েক দশক ধরে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রভাব এত দ্রুত বেড়ে গিয়েছে যে তাঁকেই সরকারের একক পরিচালক হিসেবে গণ্য করা যায়। অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান ব্যাপ্তি ও জটিলতা এর একটি কারণ। সেই সংগে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ক্রমেই বেশি পরিমাণে মান্যতা প্রাপ্ত হচ্ছে।

(১২) **দুর্বল বিচারব্যবস্থা ঃ** ব্রিটেনে বিচারবিভাগের ক্ষমতা খুব সীমিত। এখানে বিচারবিভাগ পার্লামেন্ট প্রণীত কোন আইন ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু ওই আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলতে পারে না।

(১৩) **সাংবিধানিক রীতিনীতি ঃ** ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় সংবিধানিক রীতিনীতিগুলির মূল্য অপরিসীম। এই রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হলেও শাসনকার্যে নিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তি এই রীতিনীতিগুলি মেনে চলেন এবং এই রীতিনীতিগুলির ওপর ভিত্তি করে ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে উঠেছে।

(১৪) **দ্বিদলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব ঃ** ব্রিটেনে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বর্তমান। কার্যত অনেকগুলি রাজনৈতিক দল থাকলেও দুটি মাত্র দল—রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। দুটি দলের মতাদর্শ পৃথক বলে এই ব্যবস্থাকে 'সুস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থা' বলা হয়। শাসনের অধিকার চক্রবৎ দুই দলের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকে।

(১৫) **নাগরিক অধিকার ঃ** অন্যান্য উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মত ব্রিটেনেও নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। যেমন আইনের চোখে সমানাধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, ভোটদান ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তর করার অধিকার ইত্যাদি। তবে সমালোচকদের মতে এখানে শোষণের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অধিকার না থাকায় অন্যান্য অধিকারগুলি অনেকাংশে গৌণ হয়ে পড়েছে।

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয় ঘটেছে। অভিনব এই শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের প্রতীক হিসাবে আছেন রানি। আরা ব্রিটিশ শাসনববস্থায় অভিজাততন্ত্রের প্রতীক হয় প্রিভি কাউন্সিল এবং লর্ড সভা। আর ব্রিটেনের জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন কমন্স সভা হ'ল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতীক।

অনুশীলনী----৩

১। **সঠিক উত্তরে ☑ দিন ঃ**

(ক) ব্রিটিশ সংবিধান (লিখিত/অলিখিত)।

(খ) ব্রিটিশ সংবিধান (সুপরিবর্তনীয়/দুষ্পরিবর্তনীয়)।

(গ) ব্রিটেন একটি (এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র/যুক্তরাষ্ট্র)।

(ঘ) ব্রিটেনে প্রচলিত রাজতন্ত্র (নিয়মতান্ত্রিক/চরম)।

(ঙ) ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ (আছে/নেই)।

(চ) ব্রিটেনে (দ্বিদলীয়/বহুদলীয়) ব্যবস্থা প্রচলিত।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি

গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উৎস হল সাংবিধানিক রীতিনীতি। এই রীতিনীতিগুলি হ'ল শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত সেই নিয়মকানুন যেগুলি আইনের অংশ না হ'লেও শাসনব্যবস্থায় অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। এই রীতিনীতিগুলির পিছনে আইন বা আদালতের কোন সমর্থনমূলক আদেশ না থাকলেও শাসনব্যবস্থায় নিযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিই এই রীতিনীতিগুলি বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলেন।

সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে পারি। যেমন

(ক) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

(খ) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।

(গ) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি অমান্য করলে ব্যক্তিকে কোন শাস্তি পেতে হয় না।

(ঘ) অথচ প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক রীতিনীতির বিরোধী কোনো সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগ সহজে কার্যকর হতে পারে না।

এই সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলিকে লর্ড অ্যানসন 'সংবিধানের প্রথা' নামে উল্লেখ করেছেন। জন স্টুয়ার্ট মিল তাদের 'সংবিধানের অলিখিত বিধান' নামে অভিহিত করেছেন। ডাইসি ওই নিয়মগুলিকে 'সাংবিধানিক রীতিনীতি' নামে বর্ণনা করেছেন। স্যার আইভর জেনিংস বলেন যে এই সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি আইনের শুষ্ক দেহকে রক্ত-মাংসে জীবন্ত করে তোলে। ওয়েড এবং ফিলিপিস্ বলেন সাংবিধানিক রীতিনীতি হ'ল প্রথা এবং প্রয়োজনীয়তার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা নিয়মাবলীর সমষ্টি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাদের উৎস হল মানুষের সুস্পষ্ট মতৈক্য। অন্যভাবে বলা যায়, এই রীতিনীতিগুলি সে দেশের বিবর্তনশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতির (political culture) প্রতিফলন।

আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতি

আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য বর্তমান।

(১) আইন নির্দিষ্ট ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা দ্বারা প্রণীত হয়, কিন্তু সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি কোনও সংস্থা কর্তৃক প্রণীত হয় না।

(২) আইন আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য কিন্তু সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।

(৩) আইন লিখিত, সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি অলিখিত, অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।

(৪) আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হ'লে, আইনের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৫) আইন মান্য করা বাধ্যতামূলক; সাংবিধানিক রীতিনীতি মান্য করা বাধ্যতামূলক নয়। অথচ এর বিরুদ্ধাচারণ অতি বিরল ঘটনা।

(৬) আইন লিখিতভাবে পেশ করা যায়। সাংবিধানিক রীতিনীতি লিখিতভাবে পেশ করা যায় না।

(৭) ডাইসির মতে, সাংবিধানিক রীতিনীতি সকল সময় একইভাবে প্রয়োগ হয় না। স্থানকালভেদে এর তারতম্য হতে পারে। কিন্তু আইন সর্বত্র একইভাবে প্রয়োগ করা হয়।

(৮) প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করা সম্ভব। কিন্তু সুবিধা অনুযায়ী হঠাৎ সাংবিধানিক রীতিনীতি গড়ে তোলা যায় না।

(৯) নির্ধারিত মঞ্চে জনমত যাচাই, দলীয় স্তরে আলাপ আলোচনা সংসদে বিচার বিবেচনার পর আইন তৈরি করা হয়। পক্ষান্তরে সাংবিধানিক রীতিনীতি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে নিয়ত ব্যবহারের মাধ্যমে।

(১০) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। সাংবিধানিক রীতিনীতি কোনও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে গড়ে ওঠে না।

সাংবিধানিক রীতিনীতির শ্রেণি বিভাজন

গ্রেট ব্রিটেনের সাংবিধানিক রীতিনীতিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ

(১) **রাজশক্তির ক্ষমতা সম্পর্কিত রীতিনীতি ঃ** এই ধরনের রীতিনীতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা রাজা বা রানি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হবেন; পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত বিলে রাজা বা রানি স্বাক্ষর করতে বাধ্য।

(২) **ক্যাবিনেট ব্যবস্থা সম্পর্কিত রীতিনীতি ঃ** এই শ্রেণির শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীসভা কমন্সসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকবে; প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীসভার সদস্যদের পার্লামেন্টের যে কোনও কক্ষের সদস্য হতে হবে; পার্লামেন্টে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে।

(৩) **পার্লামেন্ট সম্পর্কিত রীতিনীতি ঃ** এই শ্রেণির সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বছরে অন্তত একবার পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করতে হবে; কমন্সসভার অধ্যক্ষ বা স্পিকার দল নিরপেক্ষভাবে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন। একমাত্র পার্লামেন্টই সরকারের আয়ব্যয় অনুমোদনের ক্ষমতা রাখে।

(৪) **কমনওয়েলথ সম্পর্কিত রীতিনিতি ঃ** কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের সম্পর্কও

সাংবিধানিক রীতিনীতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন কোনও ডোমিনিয়নের অনুরোধ ক্রমেই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সেই ডোমিনিয়নের জন্য আইন পণয়ন করবে, অন্যথায় নয়। যেমন, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায় রাষ্ট্রপ্রধান পদে ব্রিটিশ রাজা বা রানির এখন বিকল্প ব্যবস্থা চালু হয়েছে ঐসব দেশেরই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

সংবিধানিক রীতিনীতিগুলি মান্য করার কারণ

সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি ভঙ্গ করলে শাস্তির কোন ভয় নেই। এই রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্যও নয়। তাই স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন ওঠে যে সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি মান্য করা হয় কেন?

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি আনুগত্যের কারণ হিসেবে ইংরেজ জাতির রক্ষণশীল মানসিকতা ও ঐতিহ্যপ্রিয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি অলিখিত ও প্রথাগত হওয়ার ব্রিটেনে একটি সুপরিবর্তনীয় শাসন কাঠামো গড়ে তুলেছে। এই সুপরিবর্তনীয়তার প্রতি জনগণের পূর্ণ সমর্থন আছে।

দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত এই রীতিনীতিগুলি শাসনব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করে। রীতিনীতি লঙ্ঘিত হ'লে শাসনব্যবস্থার ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। যেমন বৎসরে অন্তত একবার পার্লামেন্টের অধিবেশন না হলে সরকারের আয়ব্যায় অনুমোদনই লাভ করবে না।

অগ্ (০৯৯)-এর মতে সাংবিধানিক রীতিনীতি মান্য করার প্রধান কারণ হ'ল জনমতের চাপ। এই রীতিনীতিগুলির প্রতি গ্রেট ব্রিটেনের জনগণের অভ্যস্ত আনুগত্য সরকারকে রীতিনীতি মানতে বাধ্য করে।

সাংবিধানিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে আর একটি শক্তিশালী যুক্তি হল এই যে রীতিনীতি লঙ্ঘিত হলে লঙ্ঘিত নীতিকে আইনে রূপান্তরের দাবি শক্তিশালী হয়ে উঠবে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে সাংবিধানিক রীতিনীতির বাস্তব উপযোগিতার কারণেও এগুলিকে মান্য করা হয়। এই রীতিনীতিগুলি মান্য করার মধ্যে দিয়ে ব্রিটেনে গণসার্বভৌমিকতার ধারণা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়েছে।

সাংবিধানিক রীতিনীতির গুরুত্ব

বর্তমানে জটিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সব রাষ্ট্রই একটি লিখিত সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তা ছাড়া লিখিত সংবিধান ব্যতীত দেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কোন স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা এখন পর্যন্ত মূলত রীতিনীতি নির্ভর। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে ব্রিটেনে এই সাংবিধানিক রীতিনীতির অপরিহার্যতার পশ্চাতে এমন অনেক কারণ আছে যা তাদের ভূমিকাকে এত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

(১) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি আইনের কাঠামোকে গতিশীল করে সম্পূর্ণতা দান করে।

(২) এই রীতিনীতিগুলি সংবিধানকে যুগোপযোগী করে তোলে।

(৩) গ্রেট ব্রিটেনের বিদ্যমান শাসনতান্ত্রিক তত্ত্ব অনুসারে সংবিধানের কার্যপদ্ধতি যেন সুষ্ঠভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাও রীতিনীতির উদ্দেশ্যে।

(৪) রীতিনীতিগুলি সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

(৫) সাংবিধানিক রীতিনীতি সংবিধানের নমনীয়তা বজায় রাখে ও তার সীমাবদ্ধতা দূর করে।

(৬) সাংবিধানিক রীতিনীতির মাধ্যমে পুরনো আইন নতুন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখে।

(৭) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে এই রীতিনীতিগুলি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

(৮) আইন ও বাস্তব প্রয়োজনের মধ্যেকার ফাঁকটুকু পূরণ করে এই রীতিনীতিগুলি।

(৯) জনগণের ইচ্ছা ও সরকারি কর্তৃত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এই সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি।

অনুশীলনী----৪

১। ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)

(ক) ব্রিটেনের সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলির পিছনে আদালতের সমর্থন আছে।

(খ) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি অমান্য করলে কোন শাস্তি পেতে হয় না।

(গ) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি নির্দিষ্ট ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা কর্তৃক প্রণীত।

(ঘ) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি অলিখিত, অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।

২। আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করুন।

৩। সাংবিধানিক রীতিনীতি কয় প্রকার ও কী কী?

৪। সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি কেন মান্য করে চলা হয়?

আইনের অনুশাসন

গৌরবময় বিপ্লবের (১৬৮৮ খ্রিঃ) পর থেকেই আইনের অনুশাসনের ধারণা ধীরে ধীরে ইংল্যান্ডে প্রসারলাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদ শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তার প্রভাব রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং চিন্তার ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়। এইসময় আইনের অনুশাসনের ধারণা উদারপন্থী গণতান্ত্রিক চিন্তাবিদদের বক্তব্যের মাধমে জনপ্রিয়তা ও গুরুত্বলাভ করে।

সহজ সরল ভাষায় আইনের অনুশাসন বলতে বোঝায় আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাধান্য, আইনের চোখে সকলের সমানাধিকার, নির্দিষ্ট আইনভঙ্গের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগপ্রদান, প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধের বিচার প্রভৃতি। আইনের অনুশাসনের মূল কথা হ'ল সকলেই আইনের অধীন। ১৮৮৫ সালে অধ্যাপক ডাইসি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Introduction of the Law of the Constitution ('শাসনতান্ত্রিক আইনের ভূমিকা')-এ আইনের অনুশাসনের তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করেন। ডাইসির বাখ্যা অনুসারে আইনের অনুশাসনের তত্ত্বটি তিনটি নীতির

ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলি হল ঃ

প্রথমত, আইনের অনুশাসন সব রকম স্বৈরী ক্ষমতার বিরোধী। সরকারের কোন স্বৈরী ক্ষমতা থাকতে পারে না। এর অর্থ হ'ল আদালতের চোখে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যাবে না অথবা তাকে জীবন ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এর মাধ্যমে আইনের সর্বাত্মক প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে। ব্রিটেনে আইনের সর্বব্যাপী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই বলা যায় ব্রিটেনে আইনের অনুশাসনের অস্তিত্ব রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আইনের অনুশাসন অনুযায়ী কোন ব্যক্তিই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। সকলেই আইনের চোখে সমান। ক্ষমতা, অবস্থা ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে দেশের সমস্ত নাগরিকই দেশের সাধারণ আইনের অধীন। ডাইসি উল্লেখ করেছেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ পুলিশ কর্মচারী ও সরকারি কর আদায়কারীগণ অন্যান্য নাগরিকের মতই আইন বিরোধী কার্যকলাপের জন্য সমভাবে দায়িত্বশীল।

ডাইসি আইনের অনুশাসন নীতির বিন্যাসের ক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রাশসনিক আইনের ধারণাকে গ্রহণ করেন নি। ফ্রান্সে প্রশাসনিক কর্মচারীদের বিচারের জন্য স্বতন্ত্র প্রশাসনিক আদালত ছিল। ডাইসির মতে, এই নীতির প্রয়োগ আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী।

তৃতীয়ত, ব্রিটেনে নাগরিকদের অধিকার সাধারণ আইন দ্বারা সংরক্ষিত হয়েছে। অনান্য দেশে যেভাবে সংবিধানের বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা নাগরিক অধিকার স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত হয়, গ্রেট ব্রিটেনে সেইসব বিধিবদ্ধ আইন ব্যক্তি স্বাধীনতার উৎস নয়। পক্ষান্তরে বিচারবিভাগের সিদ্ধান্তই নাগরিক অধিকার সংরক্ষিত করে। বিচারবিভাগের সিদ্ধান্তকে অধিকারের উৎসরূপে গণ্য করা হয়। বিচারবিভাগ প্রধানত দেশের প্রথাগত আইন ও পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করে।

ইংল্যান্ডে আইনের অনুশাসনতত্ত্বের ব্যাপক প্রচার এবং প্রসারের মূলে আছে তার অর্থনৈতিক-সামাজিক কাঠোমোর দ্রুত পরিবর্তন। সেই সময় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থেকে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের, যে রাষ্ট্র তাদের অধিকারের রক্ষকের ভূমিকা পালন করবে। তৎকালীন পুঁজিবাদী কাঠামোয় অর্থনৈতিক ভিত্তি সংরক্ষণের জন্য তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনের কাঠামো গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক ছিল। ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্ব ওই অর্থনৈতিক ভিত গড়ে তোলার একটি প্রয়াস। আইনের অনুশাসন, আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার এবং আইনের দ্বারা সকলের সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার নীতি কার্যকর করতে চেয়েছে। তবে বাস্তবে এই সমানাধিকারের অর্থ হ'ল সম্পদশালীদের সমানধিকার। কারণ সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকলে নিঃস্ব মানুষের জন্য আইনগত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। N.P. মূল্যায়ন ঃ ডাইসির আইনের অনুশাসনতত্ত্ব নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর এই ধারণা ঊনবিংশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত। স্যার আইভর জেনিংসের মতে ডাইসির তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর একনিষ্ঠ উদ্যোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও তাঁর এই ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাখ্যায় পরিণত হয়েছে এবং বর্তমানে নানাদিক দিয়ে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

(১) ডাইসির ব্যাখ্যায় সকলপ্রকার স্ববিবেচনামূলক (discretionary) ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানকালের জটিল সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে যেহেতু বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করতে হয়, সেহেতু সরকারের হাতে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বা বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা দরকার হয়ে পড়ে। এমনকী ডাইসির সময়েও অনেক স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা (prerogatives) আইনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জেনিংস-এর মতে সরকারি কর্তৃপক্ষ ব্যাপক স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা ভোগ করে। তিনি উল্লেখ করেছেন ইংল্যান্ডে প্রকৃত স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে ন্যস্ত।

(২) ডাইসি আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তত্ত্বগতভাবে এই নীতিটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবে এই নীতি কতটা প্রযোজ্য সেই নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বস্তুত ডাইসি আইনের দৃষ্টিতে সমতার নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য যে উদ্যোগে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর নিজের দেশেই সেই নীতি সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়নি। আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। অর্থনৈতিক দিক থেকে অসম সমাজে কোনভাবেই আইনগত সমতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। অনেক সমালোচকের মতে, ডাইসি যে আইনগত সমতার বিষয় উল্লেখ করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে দেশের বিত্তশালী অংশের স্বাধীনতা ও সমতা। দেশের সকল অংশের সমতা নয়।

(৩) ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্বের তৃতীয় নীতিটিতে বলা হয় যে সাংবিধানিক আইনের দ্বারা নয়, আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ব্রিটিশ নাগরিকদের অধিকারসমূহ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই ধারণা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ইংল্যান্ডের নাগরিক অধিকারের বেশির ভাগই আদালতের সিদ্ধান্তের ফল নয়। উদাহরণস্বরূপ মহাসনদ, অধিকারের বিল, অধিকারের আবেদন, হেবিয়াস কর্পাস আইন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

(৪) অনেকসময় বিনা বিচারে ও আদালতের রায় ছাড়াই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সামাজিক স্বার্থের প্রয়োজনে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে আটক করতে পারে। ডাইসির নিজের দেশেই এই ধরনের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাপ্রসূত আইন প্রণীত হয়েছে। যেমন, ১৯১৪ সালের The Defence of the Realm Act, ১৯৩৯ সালের The Emergency Powers Act ইত্যাদি। এরই অনুসরণে ভারতের সংবিধানের ২২নং ধারা অনুযায়ী নিবর্তনমূলক আটক আইনের ব্যবস্থা আছে।

তবে উপরিউক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি যে আইনের অনুশাসন আইনগত সমানাধিকার রক্ষা এবং রাষ্ট্র কর্তৃত্বের স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

পরিশেষে বলা যায় যে আইনের অনুশাসন কেবলমাত্র আইনগত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকার এখানে স্থান পাইনি। ডাইসি এই তত্ত্বের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারনীতিবাদ প্রবর্তিত আইনগত সাম্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কোনও পুঁজিবাদী সমাজের পক্ষেই অর্থনৈতিক

সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ডাইসির দেশ গ্রেট ব্রিটেনেও তা সম্ভব হয়নি। আইনের অনুশাসন গণতান্ত্রিক দেশে স্বাভাবিক এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে পদদলিত হয়েছে। তাই মার্কস্‌বাদীরা বলেন যে বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় আইন কখনও শ্রেণিস্বার্থের ঊর্দ্ধে উঠে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হ'তে পারে না।

অনুশীলনী—৫

১। **ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)**

(ক) আইনের অনুশাসনের প্রধান প্রবক্তা ডাইসি।

(খ) ব্রিটেনে বিচারবিভাগের সিদ্ধান্তকে নাগরিক অধিকারের উৎসরূপে গণ্য করা হয়।

(গ) আইনের অনুশাসন আইনগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকারের কথা ঘোষণা করেছে।

২। ডাইসি কথিত 'আইনের অনুশাসন' যে তিনটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলির উল্লেখ করুন।

০১.৪ ❑ সারাংশ

সংবিধানের একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্দেশ করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের পক্ষে অদ্যবধি সম্ভব হয়নি। তাও এককথায় বল যায় যে সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি মৌলিক নীতিকে সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বলে।

ব্রিটিশ সংবিধান বিশ্বের প্রাচীনতম সংবিধান। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার মৌলিক আইনকানুন কোনও একটি দলিলে লিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া যায় না। তাছাড়া কোনও সংবিধান রচনাকারী পরিষদ দ্বারা এই সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয়নি। এই সংবিধান এমন একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে যেখানে সনদ, পার্লামেন্ট প্রণীত আইন, বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত, রীতি ও ঐতিহ্য এসে মিলিত হয়েছে।

ব্রিটিশ সংবিধান একটি অলিখিত সুপরিবর্তনীয় সংবিধান। এখানে পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থা চালু থাকার দরুন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র উপস্থিত। পার্লামেন্ট তত্ত্বগতভাবে সার্বভৌম। কিন্তু বাস্তবে ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব, সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদ তাদের কাজের জন্য পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল।

ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম প্রধান উৎস হল সাংবিধানিক রীতিনীতি। এই রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হলেও শাসনকার্যে নিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তি এই রীতিনীতিগুলি মেনে চলেন। এই রীতিনীতিগুলির ওপর ভিত্তি করে ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে উঠেছে।

ব্রিটিশ সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল আইনের অনুশাসন। আইনের অনুশাসনের অর্থ হল আইনের

প্রাধান্য, আইনের চোখে সাম্য এবং দেশের দেশের সাধারণ আইন দ্বারা নাগরিকদের অধিকারসমূহের সংরক্ষণ স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করতে পারেন বলে মনে করা হয়।

০১.৫ ❑ সর্বশেষ অনুশীলনী

১। ব্রিটিশ সংবিধানের উৎসগুলি কী কী?

২। ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস হিসেবে কয়েকটি ঐতিহাসিক সনদের উল্লেখ করুন।

৩। ব্রিটেনের সংবিধানকে অলিখিত সংবিধান বলা হয় কেন?

৪। ব্রিটিশ সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলা হয় কেন?

৫। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের উৎস হিসেবে কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন।

৬। ব্রিটেনে আইনের অনুশাসনের অর্থ কী? এর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি কী কী?

৭। ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কি স্বীকৃত?

০১.৬ ❑ উত্তরমালা

১। (ক) — ☑, (খ)— ☒, (গ)— ☒.

২। সংবিধান বা শাসনতন্ত্র শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে—ব্যাপক অর্থে ও সংকীর্ণ অর্থে। ব্যাপক অর্থে সংবিধান বলতে বোঝায় দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী লিখিত ও অলিখিত সকলপ্রকার নিয়মকানুনকে। লিখিত নিয়মকানুন বলতে বোঝায় আইন এবং অলিখিত নিয়মকানুন বলতে বোঝায় প্রথা, প্রচলিত রীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি। সংকীর্ণ অর্থে সংবিধান হচ্ছে কোন একটি রাষ্ট্রের লিখিত মৌলিক আইন-কানুন যার দ্বারা রাষ্ট্রের গঠন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন ও ক্ষমতা, রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক প্রভৃতি নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ধরনের সংবিধান চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং তা বিশেষ সংবিধান রচনাকারী পরিষদ দ্বারা রচিত ও গৃহীত হয়।

অনুশীলনী----২

১। (ক)— ☒, (খ)— ☑ , (গ)— ☒ .

২। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ও রাজার ক্ষমতা সংকোচন ও জনগণের ভোটাধিকার সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন করেছে। পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত এইসব আইনকেই

বিধিবদ্ধ আইন হিসাবে চিহ্নিত করা যায় এইসব বিধিবদ্ধ আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ১৬৭৯, ১৮১৬ ও ১৮৬২ সালে প্রাণীত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পর্কিত 'হেবিয়াস কর্পাস' আইন, ১৭০১ সালে প্রণীত ' সেট্‌ল্‌মেন্ট আইন', ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালে প্রণীত 'পার্লামেন্ট আইন' প্রভৃতি।

অনুশীলনী—৩

(ক) লিখিত

(খ) সুপরিবর্তনীয়

(গ) এককেন্দ্রিক

(ঘ) নিয়মতান্ত্রিক

(ঙ) নেই

(চ) দ্বিদলীয়

অনুশীলনী—৪

১। (ক)— ☒, (খ)— ☑, (গ)— ☒, (ঘ)— ☑.

২। আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন—

(ক) আইন বলবৎযোগ্য, কিন্তু সাংবিধানিক রীতিনীতি বলবৎযোগ্য নয়।

(খ) আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে, আইনের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়।

(গ) আইন মান্য করা বাধ্যতামূলক।

৩। সাংবিধানিক রীতিনীতি চারপ্রকার—(ক) রাজশক্তির ক্ষমতা সম্পর্কিত, (খ) ক্যাবিনেট ব্যবস্থা সম্পর্কিত, (গ) পার্লামেন্ট সম্পর্কিত এবং (ঘ) কমনওয়েলথ সম্পর্কিত।

৪। ১৩, ১৪, ১৫ পাতা অনুসরণ করুন।

অনুশীলনী—৫

১। (ক)— ☑, (খ)— ☑, (গ)— ☒.

২। পাঠ্যাংশের ১৩, ১৪, ১৫ পাতা-র আলোচনা দেখুন।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

১। গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের উৎস হল—(ক) সনদ, (খ) পার্লামেন্ট প্রণীত আইন, (গ) বিচারবিভাগীয় প্রণীত আইন, (গ) বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত, (ঘ) প্রথাগত আইন, (ঙ) সাংবিধানিক রীতিনীতি, (চ) আইন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী এবং বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

২। ঐতিহাসিক সনদ বা চুক্তিপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—(ক) ১২৫১ সালের 'মহাসনদ', (খ) ১৬২৮ সালের 'অধিকারের আবেদনপত্র', (গ) ১৬৮৯ সালের 'অধিকারের বিল' এবং (ঘ) ১৭০১ সালের 'সেট্‌ল্‌মেন্ট' প্রভৃতি।

৩। গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধান কোন আইনসভা, গণপরিষদ অথবা সাংবিধানিক সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত হয়নি। রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মাবলী, প্রধান প্রধান সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সংকলিত করে লিখিতভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। এই সংবিধান কোন নির্দিষ্ট সময়ে রচিত হয়নি। সেইজন্য এই সংবিধানকে অলিখিত সংবিধান বলা হয়।

৪। ব্রিটিশ সংবিধান পরিবর্তনের জন্য কোন জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয় না। সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতেই এই সংবিধান পরিবর্তন করা যায়। তবে সমালোচকদের মতে তত্ত্বগত দিক থেকে ব্রিটিশ সংবিধান যতটা নমনীয় বাস্তবে ততটা নমনীয় নয়। কেননা কোন দেশের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় না দুষ্পরিবর্তনীয় তা নির্ভর করে সমাজের প্রাধান্যকারী শ্রেণির স্বার্থ সেই সংবিধান রক্ষা করতে পারছে কি না তার ওপর।

৫। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের উৎস হিসেবে কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হল—(১) অ্যানসনের ''Law and Customs of the Constitution, যে রচিত ''Parliamentary Practice'' এবং জেনিংস-এর ''Law and the Constitution.

৬। ১৮৮৫ সালে অধ্যাপক ডাইসি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শাসনতান্ত্রিক আইনের ভূমিকা'-য় আইনের অনুশাসন তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেন। আইনের অনুশাসনের অর্থ হল আইনের সর্বাত্মক প্রাধান্য, আইনের চোখে সাম্য এবং দেশের সাধারণ আইনের দ্বারা নাগরিকদের অধিকারসমূহের সংরক্ষণ। ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শাসনতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে আইনের অনুশাসনের একটি ইতিবাচক ভূমিকা আছে।

৭। গ্রেট ব্রিটেনে ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নেই। যা আছে তা হল কাঠামোগত স্বতন্ত্রীকরণ। গ্রেট ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের পরিবর্তে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতাই প্রাধান্য লাভ করেছে। এখানে আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শাসনবিভাগের আইনগত প্রধান হলেন রানি। তিনি আবার পার্লামেন্টেরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একমাত্র বিচারবিভাগের ক্ষেত্রেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ প্রযোজ্য।

পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তির জন্য মূল্যায়ন অংশটি অনুসরণ করুন।

০১.৭ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

১। *J.Harvey and L. Bather, MacMillan*—The British Constitution, St. Martin's Press, 1970.

২। *Sir Ivor Jennings*—Cabinet Government, Cambridge University Press, 1959.

৩। *ডঃ অনাদি কুমার মহাপাত্র*—নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি পরিচয়, সুহৃদ পাবলিকেশন, ১৯৯৮।

৪। *সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মলকান্তি ঘোষ*—তুলনামূলক আধুনিক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৯৩।

৫। *সুদর্শন ভট্টাচার্য*—(প্রশ্নোত্তরে) তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, ইণ্ডিয়ান প্রোসেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ২০০০।

একক ০২ ❑ শাসনবিভাগ

গঠন

০২.১ উদ্দেশ্য

০২.২ প্রস্তাবনা

০২.৩ রাজা এবং রাজশক্তি

রাজশক্তির ক্রমবিবর্তন

রাজশক্তির ক্ষমতার উৎস

রাজশক্তির ক্ষমতা

রাজশক্তির ক্ষমতার মূল্যায়ন

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের স্থায়িত্বের কারণ

০২.৪ প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেট

প্রধানমন্ত্রী পদের উৎস

প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী

প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক মর্যাদা

ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উদ্ভব

ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীপরিষদ

পার্লামেন্ট ও ক্যাবিনেট

ক্যাবিনেট ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য

ক্যাবিনেটের গঠন ও কার্যাবলী

০২.৫ সারাংশ

০২.৬ সর্বশেষ অনুশীলনী

০২.৭ উত্তরমালা

০২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

০২.১ ❑ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- ব্রিটিশ গণতন্ত্রে আজও রাজশক্তি কিভাবে টিকে আছে।
- ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা।
- ব্রিটেনে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ।

০২.২ ❑ প্রস্তাবনা

গ্রেট ব্রিটেনে পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থা বর্তমান। এই ব্যবস্থায় একজন নাম সর্বস্ব অথবা নিয়মতান্ত্রিক শাসক থাকেন যিনি নামে শাসক কিন্তু প্রকৃত কোন ক্ষমতা ভোগ করেন না। তাঁর নামে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। তিনি হলেন রাজা বা রানি।

ব্রিটেনে প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদ। প্রধানমন্ত্রী হলেন ব্রিটেনের প্রশাসনিক কাঠামোয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁকে কেন্দ্র করেই ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর প্রভাব এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে বহু সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও লেখক গ্রেট ব্রিটেনের সরকারি ব্যবস্থাকে প্রধানমন্ত্রীর শাসিত শাসনব্যবস্থারূপে অভিহিত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীকে প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করে তাঁর ক্যাবিনেট। এই ক্যাবিনেটই ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির মস্তিষ্ক বিশেষ। তাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র প্রশাসন আবর্তিত হয় এবং আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের সংযোগ রক্ষিত হয়।

০২.৩ ❑ রাজা ও রাজশক্তি

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজা ও রাজশক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাই এই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

শক্তির ক্রমবিবর্তন

ব্রিটিশ রাজতন্ত্র বিশ্বের মধ্যে প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান যা আজও তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। দীর্ঘ কয়েক শতকের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজশক্তি আজ বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। ইতিমধ্যে ব্রিটেনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। এর ফলে রাজশক্তির মধ্যেও এসেছে পরিবর্তন। এই রাজশক্তির বিকাশের মাধ্যমেই ওই দেশের সাংবিধানিক কাঠামোর বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নবম শতাব্দীর তৃতীয় দশকে রাজা এগবার্টের সময় থেকেই রাজশক্তির সূচনা।

একাদশ শতকে রাজা উইলিয়মের সময়ে ইংল্যান্ডে সামন্ততন্ত্রের অধ্যায় শুরু হয়। তিনি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত প্রাধান্য লাভ করেন। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকে সামন্ত ও যাজকশ্রেণির সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে রাজশক্তির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ষোড়শ শতকে ইংল্যান্ডে টিউডর আমলে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ, নতুন গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্থায়িত্ব ও সম্ভাবনা সৃষ্টিতে সাফল্যলাভ করার ফলে টিউডর স্বৈরশাসন দীর্ঘদিন বজায় ছিল।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডের সামাজিক জীবনে বিপুল পরিবর্তন আসতে শুরু করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্রুত প্রসার সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিতে দুর্বল করে দিতে শুরু করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির সামাজিক উত্থানের জন্য রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক উৎপত্তির ভিত্তি ও সামন্তদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। চরম রাজতন্ত্র ছিল সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থের প্রধান রক্ষক। এই চরম রাজতন্ত্রকে সমর্থন জানাবার জন্য ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ প্রচারিত হয়েছিল যেখানে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক ভিত্তিকে ধ্বংস করার প্রয়োজন ছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বেই রাজতন্ত্রের অবাধ কর্তৃত্ব ও সামন্তদের দাপটের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। তারই ফলশ্রুতি গৌরবময় বিপ্লব ১৬৮৮ সালে। এই বিপ্লবের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজশক্তির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। পার্লামেন্ট মূল ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং রাজতন্ত্র ক্রমে আলঙ্কারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনকালে এই সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রও জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছেছিল। বর্তমান শতকেও রাজতন্ত্রের ভূমিকা অব্যাহত আছে। এর কারণ রাজশক্তি প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সংরক্ষকের ভূমিকা পালন করে।

রাজশক্তির ক্ষমতার উৎস

ব্রিটেনে রাজশক্তির ক্ষমতা বলতে একদিকে ব্যক্তি হিসেবে রাজা বা রানির ক্ষমতাকে বোঝায়, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানরূপে রাজশক্তির ক্ষমতাকে বোঝায়। বর্তমানে রাজশক্তি বলতে প্রাতিষ্ঠানিক রাজাকেই বোঝায়। গণতন্ত্র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনে ব্যক্তিগত রাজার নিকট থেকে ক্ষমতা প্রাতিষ্ঠানিক রাজার নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে।

অতএব আমরা বলতে পারি যে রাজা ব্রিটেনের প্রশাসনিক প্রধান যদিও বাস্তবে তিনি নামসর্বস্ব শাসক অথবা নিয়মতান্ত্রিক শাসক।

আমরা জানি যে ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত সংবিধান এবং মুখ্যত তা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। স্বভাবতই ব্রিটিশ রাজশক্তির ক্ষমতা কোন সংবিধানে বর্ণিত হয়নি। রাজশক্তির ক্ষমতার প্রধান দুটি উৎস হ'ল ঃ (১) রাজকীয় বিশেষাধিকার (Royal Prerogatives) এবং (২) পার্লামেন্ট প্রণীত আইন (Statute)।

(১) **রাজকীয় বিশেষাধিকার ঃ** একসময় রাজা ছিলেন প্রকৃত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী কিন্তু গৌরবময় বিপ্লবের পর রাজশক্তির ক্ষমতা হ্রাস করা হয় এবং পার্লামেন্টকেও তার ক্ষমতা ধীরে ধীরে হস্তান্তরিত করতে হয় পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বশীল এক ক্যাবিনেটের ওপর। এর পরেও তাঁর পূর্বতন স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতার মধ্যে যা অবশিষ্ট আছে তাকেই রাজকীয় বিশেষাধিকার বলা হয়। বস্তুত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজকীয় বিশেষাধিকার বলতে সার্বভৌম রাজশক্তির সেই সকল ক্ষমতাকে বোঝানো হয় যা তিনি বিধিবদ্ধ আইনের পরিবর্তে আইনের মাধ্যমে অর্জন করেছেন। বর্তমানে রাজকীয় বিশেষাধিকারকে অবশিষ্ট (Residue) ক্ষমতারূপে বিবেচনা করার কারণ হ'ল পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে এই ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারে। পার্লামেন্ট আইনের মাধ্যমে কোনও কোনও বিশেষাধিকারকে অধিগ্রহণ করেছে। আবার কোনও কোনও বিশেষাধিকার দীর্ঘকাল প্রয়োগ না করার ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে আইনগতভাবে বিশেষাধিকার রাজার হাতে ন্যস্ত। তবে এটি একটি নিছক ধারণামাত্র। রাজশক্তি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। তাছাড়া এই ক্ষমতার প্রয়োগ আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত। আদালত এই ক্ষমতার প্রয়োগে কাউকে বাধ্য করতে পারে না এবং এই ক্ষমতা লঙ্ঘিত হ'লে কোনও ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারেন না।

কয়েকটি রাজকীয় বিশেষাধিকার ঃ

(১) রাজা/রানি সকল ন্যায়নীতির উৎস। (The King/Queen is the fountain of Justic.)

(২) রাজা/রানি সকল রাষ্ট্রীয় সম্মানের উৎস। (The King/Queen is the fountain of state Honour).

(৩) রাজা/রানি সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। (The King/Queen is the Head of the Armed Force).

(৪) রাজার মৃত্যু নেই। (The king never die.)। এক রাজা বা এক রানির মৃত্যু হ'লেও সিংহাসন শূন্য থাকে না। রাজতন্ত্র অব্যাহত থাকে।

(৫) পার্লামেন্ট বিষয়ক রাজকীয় বিশেষাধিকার (Prerogatives relating to Parliament). রাজা/রানি পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান, সমাপ্তি ঘোষণা এবং মুলতুবি রাখার ক্ষমতা ভোগ করেন। রাজা/রানির সম্মতি ব্যাতীত পার্লামেন্ট প্রণীত কোনও বিল আইনে পরিণত হয় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিশেষাধিকার বলতে রাজশক্তির মধ্যযুগীয় ক্ষমতার সেই অবশিষ্ট অংশকে বোঝায়, যা প্রথাগত আইন এবং পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের মাধ্যমে সংশোধন ও প্রত্যাহার করা হয়নি।

ব্রিটেনের রাজশক্তির ক্ষমতার দ্বিতীয় উৎস হল বিধিবদ্ধ বা পার্লামেন্ট প্রণীত আইন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বিধিবদ্ধভাবে রাজাকে কতকগুলি ক্ষমতা দিয়েছে।

অনুশীলনী ---- ১

১। ব্রিটিশ রাজশক্তির ক্ষমতার প্রধান দুটি উৎস কী?

২। ব্রিটেনের রাজা বা রানির বিশেষাধিকার সম্পর্কিত রীতিনীতির দুটি উদাহরণ দিন।

৩। ব্রিটেনের রাজা বা রানির বিশেষাধিকার বলতে কী বোঝায়?

রাজশক্তির ক্ষমতা

ক্ষমতার প্রকৃতি অনুযায়ী রাজশক্তির ক্ষমতাকে শাসনসংক্রান্ত, আইনসংক্রান্ত, বিচারসংক্রান্ত এবং অন্যান্য ক্ষমতা—এইভাবে ভাগ করা যায়।

শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা—তত্ত্বগতভাবে ব্রিটেনে শাসনসংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা রাজা বা রানির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এখানে ক্ষমতার মূল কেন্দ্রবিন্দু হ'লেন রাজা বা রানি। শাসন সংক্রান্ত সব ক্ষমতাই রাজা বা রানির নামে প্রয়োগ করা হয়। শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঃ

(ক) যাতে আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তা দেখা এবং তাকে সুনিশ্চিত করা।

(খ) প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করা এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করা; শাসনবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং বিচারকদের নিয়োগ করা; স্থল, নৌ, বিমানবাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ করা।

(গ) এইসব কর্মচারীদের অপসারণ করা।

(ঘ) স্থল, নৌ, বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে সামরিক বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া।

(ঙ) রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা রাজার হাতে ন্যস্ত। বৈদেশিক কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের পরিচয়পত্রও তিনি গ্রহণ করেন।

(চ) আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন করা।

(ছ) যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন করা।

(জ) ডমিনিয়ান ও উপনিবেশগুলির শাসনকার্য পরিচালনা করা। রাজা ডমিনিয়ানসমূহের ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুযায়ী তাদের গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করেন।

আইনংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ ব্রিটেনে রাজা বা রানি পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্রিটেনে পার্লামেন্ট বলতে রাজাসহ পার্লামেন্টকে বোঝায়। কারণ ব্রিটেনের রাজা বা রানি এবং লর্ডসভা ও কমন্সসভাকে নিয়েই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গঠিত।

ব্রিটেনে পার্লামেন্ট গঠনে রাজার ভূমিকা নেই। কিন্তু আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজা এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাজা বা রানির আইনসংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঃ

(ক) আইনসংক্রান্ত ক্ষমতাবলে রাজা বা রানি পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন, স্থগিত রাখেন এবং প্রয়োজনে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ বা কমন্সসভা ভেঙে দিতে পারেন।

(খ) পার্লামেন্টের পাশ হওয়া বিল রাজা বা রানির সম্মতিলাভ করলে আইনে পরিণত হয়।

(গ) ব্রিটেনের রাজা পার্লামেন্টের উদ্বোধনী ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী এই ভাষণ রচনা করেন।

(ঘ) রাজশক্তির কিছু আদেশ জারির ক্ষমতাও আছে। এই আদেশ জারির মাধ্যমে নির্দিষ্ট শাসন বিভাগীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। এই আদেশকে সপরিষদ রাজাজ্ঞা (Orders-in-Council) বলা হয়।

(ঙ) রাজা বা রানি অনেক সময় পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। তবে রাজা বা রানি তাঁদের আইনসংক্রান্ত সব ক্ষমতাই মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োগ করে থাকেন। বস্তুত আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজার ক্ষমতা নিতান্তই নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ক্ষমতার অনুরূপ।

(চ) রাজা বা রানির পূর্বসম্মতি নিয়ে কমন্সসভার অর্থ বিল ও বার্ষিক বাজেট পেশ করা হয়।

বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ রাজা বা রানিকে ব্রিটেনের সকল ন্যায়বিচারের উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী রাজা বা রানি তাঁর বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। তাঁর বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(ক) রাজা বা রানি বিচারপতিদের নিয়োগ করেন।

(খ) পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যৌথ আবেদনের ভিত্তিতে তিনি বিচারপতিদের পদচ্যুত করতে পারেন।

(গ) রাজা বা রানির নামে সকল প্রকার বিচার পরিচালিত হয় এবং রাজার নামে অপরাধীদের দন্ড দেওয়া হয়।

(ঘ) রাজা বা রানি বিচারালয়ে দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দন্ড হ্রাস বা মুকুব করতে পারেন।

(ঙ) কমনওয়েলথ ভুক্ত কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র এবং উপনিবেশগুলির বিচারালয় থেকে আসা আপিল বিচারের ক্ষেত্রে তিনি বিচারকার্য সম্পাদন করেন।

অন্যান্য ক্ষমতা ঃ

(ক) ব্রিটেনের রাজা বা রানি ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের চার্চের প্রধান। এই দায়িত্ব থেকেই তিনি প্রধান যাজক ও অন্যান্য যাজকদের নিযুক্ত করেন। চার্চের বিভিন্ন বিধি ও আইনসমূহ রাজার অনুমতিসাপেক্ষ। তবে চার্চ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে প্রিভি কাউন্সিলের বিচারবিভাগীয় কমিটির মাধ্যমে সেই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাজা বা রানির সঙ্গে ক্যাথলিক চার্চের কোনও সম্পর্ক নেই।

(খ) ব্রিটেনের রাজা বা রানির হাতে সম্মানজনক উপাধি বন্টনের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। সেই জন্য রাজা বা রানিকে সকল সম্মানের উৎস বলা হয়। ব্রিটেনে নববর্ষ, রাজ্যভিষেক অথবা রাজা/রানির জন্মদিন উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানসূচক উপাধি ও পদবি বন্টন করা হয়।

ব্রিটেনের রাজা বা রানি ইংল্যান্ডের এবং স্কটল্যান্ডের চার্চের প্রধান চার্চের বিধি ও আইনসমূহ রাজার অনুমতি সাপেক্ষ।

ব্রিটেনের রাজা বা রানি কমনওয়েলথ-এর প্রধান। তাঁর মাধ্যমেই ব্রিটেনের সঙ্গে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সংযোগ রক্ষিত হয়েছে।

অনুশীলনী ---- ২

১। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কে?

২। ব্রিটেনে রাজা কোন্ ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন?

৩। সপরিষদ রাজাজ্ঞা (Orders-in-Council) কাকে বলে?

৪। ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের যে কোনও একটি বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতার উল্লেখ করুন।

রাজশক্তির ক্ষমতার মূল্যায়ন

ব্রিটেনের রাজশক্তির পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে দুটি পরস্পরবিরোধী মতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম মতের সমর্থকরা রাজা বা রানিকে ব্রিটেনের প্রকৃত শাসক বলে চিহ্নিত করে তাঁর বিপুল ক্ষমতার উল্লেখ করেন। ওয়ালটার বেহজট-এর মতে এখনও রানির পরামর্শদান সতর্ক করার এবং উৎসাহদানের ক্ষমতা আছে। তিনি প্রয়োজনবোধে তাঁর দীর্ঘকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীসভাকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীকে স্বমতে আনয়নে বাধ্য করতে পারেন। মন্ত্রীসভা কর্তৃক রাষ্ট্রস্বার্থবিরোধী কোনও নীতি গৃহীত হ'লে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। গঠনমূলক কাজেও রাজা বা রানি মন্ত্রীসভাকে উৎসাহিত করতে পারেন। বার্কারও রাজশক্তিকে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার 'ক্রিয়াশীল' অংশরূপে চিহ্নিত করতে চান। রাজশক্তির গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে গ্ল্যাডস্টোন উল্লেখ করেছেন যে ইংল্যান্ডে রাজা জাতীয় ঐক্যের প্রতীক এবং সামাজিক কাঠামোর শীর্ষে অবস্থিত। তিনি আইন-প্রণেতা, চার্চের প্রধান, ন্যায়বিচার এবং সকল সম্মানের একমাত্র উৎস। তিনি মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত, আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন, যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তিস্থাপন করেন। তিন সার্বভৌম পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন ও কমন্সসভা ভেঙে দিতে পারেন।

কিন্তু দ্বিতীয় মতের সমর্থকরা উপরোক্ত বক্তব্যের বিরোধিতা করে এই অভিমত পোষণ করেন যে তত্ত্বগতভাবে ব্রিটেনের রাজা বা রানি ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হ'লেও বাস্তবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজা বা রানি পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। তিনি